ফাল্গুনী

চিরসবুজের নিবেদন

সম্পাদনা

অপর্ণা মণ্ডল

FALGUNI : CHIRO SOBUJER NIBEDON, A critical study of the play Falguni Edited *by* Aparna Mondal, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2, Ramanath Majumder Street. Kolkata-700 009, July-2015, Rs. 150.00

© লেখক

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
১৭ জুলাই, ২০১৫

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
অতনু গাঙ্গুলী

অক্ষর বিন্যাস
শালিনী ডটস্
১৯/এইচ/এইচ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৬

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN: 978-93-83590-91-9

মূল্য : একশো পঞ্চাশ টাকা

সূচিপত্র

সময়ের বাহক 'ফাল্গুনী'	১১	অপর্ণা মণ্ডল
চরিত্রের নাম শুধুই নাম নয়...	২১	তপন মণ্ডল
ফাল্গুনী নাটকের প্রেক্ষাপট ও ভাষার গতিময়তা	৩২	দুরন্ত মণ্ডল
'ফাল্গুনী' নাটকের সংলাপ	৪০	বিদেশচন্দ্র নস্কর
'ফাল্গুনী' : নামকরণের আড়ালে	৪৪	সেক আপতার হোসেন
'ফাল্গুনী' নাটকের শ্রেণি বিচার	৫০	তুহিনা বেগম
ফাল্গুনী : ঋতুনাটক	৫৫	প্রণবকুমার দাঁ
ফাল্গুনী : বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির সম্পর্ক	৬৪	বাপুলী মণ্ডল
ফাল্গুনী : নিগূঢ় জীবনতত্ত্ব	৬৯	সৈকত মিস্ত্রী
ফাল্গুনী নাটক : সমাজ ও রাজনীতির কথা	৭৬	মোহা : সাদেকুল ইসলাম
রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী : নবজীবনের বার্তা	৭৯	মলয় দাস
"ফাল্গুনী" : গান : প্রাসঙ্গিকতা	৮৩	চিত্রা মণ্ডল
রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী : গল্পের নির্যাসে পরাবাস্তবতা	৯৯	শুভদীপ সরকার
মূল নাটক	১০৩	

'ফাল্গুনী' : নামকরণের আড়ালে

সেক আপতার হোসেন

রচনা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নামকরণের আড়ালে ধরা দেয়, আবার সার্থক নামকরণ রচনার রসমূল্যকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে। তাই নামকরণ রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রবীন্দ্র সাহিত্যাকাশে নামকরণের বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ রূপে ধরা দিয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ যেমন একজন সাহিত্যিক, তেমনি তিনি উচ্চমানের একজন দার্শনিক। তাই চোখে দেখা স্থূল জীবন ও মহাজীবনকে তিনি এক সূত্রে গেঁথেছেন। তাঁর সাহিত্য চেতনার গভীরতায় তার অন্তদর্শন সার্থক রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের নামকরণ খুবই ব্যঞ্জনাবহ।

'ফাল্গুনী' নাটকের মূল অংশ 'বসন্তের পালা' নামে ১৩২১ সালে ও 'সূচনা' অংশ 'বৈরাগ্যসাধন' শিরোনামে ১৩২২ সালে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। পরে একত্রে এটি 'ফাল্গুনী' নামে ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'ফাল্গুনী' নাটকে ফাল্গুন মাসের কথা রয়েছে। রয়েছে বসন্ত উৎসবের পটভূমি। বরং বলা যায়—বসন্ত উৎসবের জন্য 'ফাল্গুনী' নাটকের যাত্রা এবং বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে ফাল্গুনী নাটকের সমাপ্তি—তাই এ নাটকের নাম ফাল্গুনী—এ কথা বললে ভুল হবে। কারণ ফাল্গুন মাসের পরিবেশ তথা ফাল্গুনী তথা বসন্ত—উৎসব এ নাটকের বাহ্যিক অবস্থান মাত্র। বরং বসন্ত উৎসবের আবহে জরাগ্রস্থ জীর্ণ সমাজকে বসন্তময় যৌবনে উত্তরণের নাটক ফাল্গুনী। ফাগুনের রঙে রঞ্জিত মানব-হৃদয়ের আলোকিত উদ্‌ভাবনই এ নাটকের প্রধানতম দিক। কালের প্রবাহে, প্রকৃতির নির্মোহ দৃষ্টিতে কম্পিত, বিগলিত, স্থলিত ও পুনঃজাগরিত মানব জীবন ও মানব জগতের চিরন্তন এগিয়ে চলার স্রোতে এ নাটক বহমান। যেখানে শারীরিক বয়স মানসিক বয়সের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। তাই ফাল্গুনের ফাল্গুনী চলার বেগে রাস্তা সৃজন করেছে। এখানেই নাটকের নাকরণের সার্থকতা প্রকাশ পেয়েছে। যা 'বসন্তের পালা' কিংবা 'বৈরাগ্যসাধন' নামকরণে পরিস্ফুট হয়নি।

নাকরণের সার্থকতা বিচারের বিচিত্রমুখী মানদণ্ডগুলি হল :

(ক) কাহিনিগত দিক ও নামকরণের সার্থকতা
(খ) চরিত্রগত দিক ও নামকরণের সার্থকতা
(গ) তাৎপর্য ধর্মের উন্মেষণ ও নামকরণের সার্থকতা।

—এই ত্রিবিধ মাত্রায় 'ফাল্গুনী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করা যেতে পারে।

কাহিনিগত দিক

'ফাল্গুনী' নাটকের কাহিনি ফাল্গুন মাসের উৎসব তথা বসন্ত উৎসব কেন্দ্রিক। বৃদ্ধ নামক জরাকে উপড়ে যৌবনের অভিষেক ঘোষণা এ নাটকের মূল বিষয়। কাহিনির শুরুতে গতিময় জীবনের স্রোতে সংশয়িত চরিত্র হিসাবে মহারাজ চরিত্র আনা হয়েছে। মন্ত্রির সঙ্গে মহারাজের কথোপকথনে তার প্রমাণ পওয়া যায়।—

'মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।

কিন্তু প্রত্যন্ত বিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেছে যে।

যুদ্ধ চলুক কিন্তু তার সংবাদটা চলবে না।

চীন সম্রাটের দূত অপেক্ষা করছেন।

অপেক্ষা করতে দোষ নেই কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।'

কারণ তিনি বৃদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তাই পাকাচুল সরানোকে কেন্দ্র করে তিনি জানান–

'যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্র লিখককে তো সরানো যায় না। অতএব এ পত্র শিরোধার্য করাই গেল'।

এখানে দেখা যায় তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু কবি শেখরের উপস্থিতি তাকে নতুন উন্মাদনা এনে দেয়। মন্ত্রীর সঙ্গে মহারাজের কথোপকথনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।–

'মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ কেন।

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে।

বিজয় বর্মাকে বিদায় করে দিতে।

কী মুশকিল বিদায় করবে কেন। যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে।

চীনের সম্রাটের দূতের জন্য বাহনের ব্যবস্থা–

কেন, বাহন কিসের।

মহারাজের তো দর্শন হবে না, তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার–

মন্ত্রী, আশ্চর্য করলে দেখছি–রাজকার্য কি এমনি করেই চলবে। হঠাৎ তোমার হল কী।'

কিন্তু মহারাজ জানেন কবিশেখরের অনুপস্থিতি ও শ্রুতিভূষণের ' বৈরাগ্যবারিধি' তাকে আবার জীবন বিমুখ করে তুলবে। কিন্তু মহারাজ নিজেকে, আত্মসত্তাকে হারিয়ে দিতে চাননা। তাই কবিশেখরকে অনুরোধ জানান–

'একটা যা–হয় কিছু করো–যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি তাই করছে, তেমনি তরো।'

তাই মূল নাটকে দেখা যায়–জরাগ্রস্থ সমাজের বুক চিরে যৌবনের উদ্দাম গতিতে এগিয়ে যাওয়ার পদধ্বনি–যেখানে সর্দার জানায়–

'যদি বাঁচবই তবে বাঁচার মতো করেই বাঁচতে হবে।'

তাই সমস্ত নাটক জুড়ে রয়েছে বার্ধক্যের প্রতিবাদ। এই মানসিক প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে যৌবনের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। নাট্যকার যৌবনের স্বতস্ফূর্ত গতিকে প্রকাশ করেছেন এভাবে–

'চলরে সোজা, কেন রে বোঝা
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা।
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে।'

তবে বাস্তববাদী দার্শনিকের মত রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে—অভিজ্ঞতাহীনতায় যৌবনের গতি মাঝে মাঝে থমকে যায়। তখন পৃথিবী সঙ্কটময় হয়ে ওঠে। মনে হয়—

'আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরা নদী বয়ে চলেছে তার কথা মনে পড়ছে ভাই।

সেদিন মনে হয়েছিল, যে বলছে, চল চল চল—আজ মনে হচ্ছে ভুল শুনেছিলুম, সে বলছে ছল, ছল, ছল।'

তখন যুব সমাজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়—

'চলজ্জীবন যৌবনং—আমাদের জীবনও থাক্,
যৌবনও থাক, আমরা চলব না।'

কিন্তু যৌবন প্রতিশ্রুতি পালন করে না। সে বার বার ভাঙে, বার বার গড়ে।

তখন মনে হয়—

'নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে। কীর্তি তো আমাদের ফেনা—ছড়াতে ছড়াতে চলে যাব। ফিরে তাকাব না।'

নাটকের শেষে তাই দেখা যায়—যে বৃদ্ধের খোঁজে যুব সমাজ যাত্রা করেছিল, সে বৃদ্ধকে পাওয়া যায়নি। আসলে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন—কোটি কোটি বছর ধরে এই পৃথিবী ও সৌরজগৎ বয়ে চলেছে নিজস্ব গতিতে। এখানে সে সবথেকে পুরানো আবার নিত্য নতুন। কারণ বার্ধক্য, জরা জীবনের শেষ কথা বলে না। যৌবনের শক্তির কাছে সব থমকে দাঁড়ায়। কেবল যৌবন এগিয়ে চলে আবহমানকাল থেকে অনির্দেশ্য পথের দিকে। তাই নাটকের শেষে গানের মধ্যে জানানো হয়েছে—

'যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাপ দিয়ে পড় অনন্তে।

—এভাবে নাটকের শেষে সবাই বসন্ত উৎসবে যোগদান করেছে। ফাল্গুনের রঙে সাদাচুলে আবার রং ধরেছে। এই চিরনবীন জীবন সত্তা কেন্দ্রিক বিষয় ফুটিয়ে তোলার মধ্যে ফাল্গুন মাসের ফাল্গুনী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে বিষয় কেন্দ্রিক নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে।

চরিত্রগত দিক

'ফাল্গুনী' নাটকের চরিত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে—চরিত্রের মধ্যেই নাটকের মূল সুর ফুটে উঠেছে। 'ফাল্গুনী' নাটকের একদিকে প্রকৃতি, অন্য দিকে মানব। যে সুর বসন্তে গীত হচ্ছে, সে সুর যৌবনে প্রতিনিয়ত জাগছে। চন্দ্রহাস, কবিশেখর, সর্দার, অন্ধবাউল ও ছেলের দলের মধ্যে সেই সুর বেজে চলেছে।

নাট্যকার তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এভাবে—'পৃথিবীর বয়েস অনন্ত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হতে ওর লজ্জা নেই।' এই অভিব্যক্তিই ব্যঞ্জিত হয়েছে চন্দ্রহাস চরিত্রের মধ্যে। সে জানায়—

'দাদা, তুমি বসে বসে চৌপদী লিখছ, আর এই চেয়ে দেখো, সমস্ত জল-স্থল কেবল নবীনে হবার তপস্যা করছে।'

কেবল পরের কাছে জীবনের জয়গান নয়, সে নিজেও মনে করে—'আমরা সব বয়সের গুটিকাটা প্রজাপতি।' এ ভাবে চন্দ্রহাস চরিত্র যৌবনের জয়ধ্বনি হয়ে উঠেছে।

কবিশেখর চরিত্রের মধ্যে গতির প্রকাশ ঘটেছে। তাই সে বলে—

'পাথরের গুহা ছেড়ে যে নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেননি মহারাজ। যে অনায়াসে আপনাকে টেনে দিতে দিতেই আপনাকে পায়।' এভাবে নিজেকে মিলনের আনন্দ উপলব্ধি করেছে কবিশেখর। তাই যে ডাক দিয়েছে—

'ঘরের কোণে তোদের থলি—থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে—বেরিয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায় ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।'

কারণ সে মনে করে—

'দরজার বাইরে ক্রমে কান্না উঠেছে সে কান্না থামায় কারা। যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব দিয়েছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে বলেই জগতের কিছুতেই যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।'

—এই এগিয়ে চলার গতির মন্ত্রই কবিশেখর চরিত্রের অন্যতম দিক।

নাটকের অন্যতম একটি চরিত্র সর্দার—সে বুড়ো ধরা খেলায় যৌবনের দলকে অংশগ্রহণ করায়। কিন্তু সে জানায়—

'আমি তাকে বিশ্বাস করি নে।'

তবুও নিজেই তার সন্ধানে বেরিয়েছে এবং বুড়োর অস্তিত্ব মুছে দিয়ে আবার ফিরে এসেছে। তখন তার মধ্যে আর সংশয় নেই। অন্ধকার গুহা থেকে সে আলোর পথে যাত্রা করেছে। তখন সে জানায়—

'বুড়ো কোথায়? কোথাও তো নেই।'

কেবল মানুষ আছে, আর মানুষের যৌবন আছে।

এই যৌবনেরই প্রতীক হিসেবে দেখা যায় যুবক ছেলের দলকে। যারা পৃথিবী ব্যাপী যৌবনের স্রোতে নিজেদের গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তাদের জীবনেও নানা বাধা এসেছে, তাদের যৌবন শক্তি মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়েছে। তবুও তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে—

'বুড়ো হয়ে মরব, তবু বয়েস হবে না। বয়েস হলেই সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।'

তাদের এই আত্মশক্তিই তাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এদের মধ্যে দিয়েই ফাল্গুনী নাটকের মূল সুর ব্যক্ত হয়েছে।

তবে অকুতোভয় হিসেবে ধরা দিয়েছে অন্ধবাউল। তার ভয়হীনতার কারণ স্মরণ করা যেতে পারে।—

'এক দিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।'

উপরি উক্ত চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা গেল—যৌবনের নানা বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য চরিত্রগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে—এখানে কোনো ব্যক্তি চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠেনি। তাই নাটকের নামকরণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হওয়াটাই যথার্থ বলে মনে হয়। এখানে সমস্ত চরিত্রের সমগ্র ব্যঞ্জনাই নাটকের শিল্পরসকে জারিত করেছে।

তাৎপর্যগত-দিক

নাট্যকার চরিত্রকে কেন্দ্র করে যৌবনের জয় ঘোষণা করলেও তা-নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রকেন্দ্রিক নয়। বরং বলা যায় যৌবনের জয় ঘোষণা করতে নাট্যকার চরিত্রকে মাধ্যম করেছেন। তিনি দেখতে চেয়েছেন জীবনের মাহাত্ম্যকে—যা বয়ে এসেছে আবহমান কাল থেকে এবং তা ক্রমশ এগিয়ে যাবে যতদিন জীবন থাকবে মানুষের, মানুষের পৃথিবীর। তাই নাটকের নামকরণ ব্যক্তি কেন্দ্রিক না হয়ে চরিত্রের নির্যাস রূপে অবস্থান করছে। অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতি তথা বিশ্বচেতনা। নাটক থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

'বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে সেই লীলা।'

মানব তার অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে, বিশ্ব প্রকৃতির কাছে। তাই সে শিক্ষা নিচ্ছে প্রকৃতির কাছে তাৎপর্যময় জীবন সংগ্রামের জন্য। নাটক থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

(ক) 'নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে।'

(খ) 'আত্ম রস লক্ষ্য ছিল ব'লে
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে,
ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।'

—এখানে আত্ম ত্যাগের মাধ্যমে কেবল বিশ্বের প্রতি একাত্মতা রক্ষা নয়, বরং বিশ্বের অনন্ত স্রোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি আমির বিশ্বাত্মক হয়ে ওঠা দেখানো হয়েছে।

কিন্তু জীবনের গতিপথ সোজা নয়, তা বঙ্কিম। তাই রাজ-প্রাসাদের ঐশ্বর্যের মধ্যেও শান্তি নেই। কেবলই মনে হয়—'সেই বুড়োই তো সবচেয়ে বেশি করে আছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তার বাসা।'

—এখানে মৃত্যু চিন্তা গ্রাস করেছে যৌবনকে। এই সংশয় পূর্ণ জীবন চেতনা যৌবনের ধ্বজাকে নানা ভাবে নাড়া দিয়েছে। তাই যে নদীর 'চল্' 'চল' ধ্বনির মধ্যে একদিন চলার শক্তি পেয়েছিল যুব সমাজ, সেই নদীর ডাককে আবার মিথ্যে, ছলনাময় বলে মনে হয়। কিন্তু এই গুমোটের ঘোমটা খুলে দিন বৈশাখের এক পশলা বৃষ্টি। বারবার হারিয়ে আবার নিজেকে নতুন করে পাওয়া গেল। মৃত্যুর কোল থেকে সর্দারের বেরিয়ে আসা তাই যৌবনের দ্যোতনাকেই

স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই আপাত নিয়ম বহির্ভুত ও বিশ্ব নিয়মের অন্তর্গত সুরের মূর্ছনাই ফুটে উঠেছে গানের মধ্যে–

'কোন ক্ষেপামির তালে নাচে
পাগল সাগর নীর
সেই তালে যে পা ফেলে যাই,
রইতে পারি স্থির।
চলবে সোজা, ফেলবে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে।'

ব্যক্তি আমিকে বিশ্ব আমির মধ্যে আবিষ্কার ব্যক্তির জীবনকে যৌবনময় করে তুলেছে। যেখানে ভবিষ্যতের চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে যৌবনকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয় না। বরং যৌবনের চলার গতিতেই নির্মিত হবে ভবিষ্যতের পট। তাই বসন্ত উৎসবের মধ্যে 'আবালবৃদ্ধ' জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। এখানে বসন্তের রং পাকাচুলকে রঙিন করে তুলবে না সত্য, কিন্তু পাকাচুলওয়ালাকে রঙিন করে তুলবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।–এভাবে নাটকে দৃশ্যমান হল–ফাল্গুনী কেবল ফাল্গুন মাসের পরিবেশ রূপে নয়,ফাল্গুনী এখানে যৌবনের নীড়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এই ব্যঞ্জনাধর্মীতার মধ্য দিয়েই নামকরণটি সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির রঙে রঞ্জিত রোমান্টিক কবি তাই গীতবিতানে জানালেন–

"একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি–
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।।' (গীতবিতান, ১৯৮ নং গান)

সহায়ক গ্রন্থ

১। শঙ্খ ঘোষ : কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক।
২। অশোক সেন: রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা।
৩। প্রমথনাথ বিশী: রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ।

লেখক পরিচিতি : গবেষক–বাংলা বিভাগ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

ফাল্গুনী

বসন্ত তার কবিকে ডাক দেয়, ডাক পাঠায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে। দোলা লাগে পলাশের ডালে, মনেও। **শুধু** চৌপদী লেখা দাদার মনের নাগাল সে কিছুতে পায়না। তারুণ্য ছোটে বার্ধক্যটাকে তাড়া করে। অন্ধ বাউলের মনের পথ ধরে তারা খুঁজে চলে শীতবুড়োকে। কিন্তু জীর্ণ করে ভরে দেওয়ার খেলা যার নিত্যদিনের, তার নাটমন্দিরে শীত-বসন্তের পালা কেবলই প্রাণময় হয়ে বয়ে চলে। শীতের উল্টোপিঠেই থাকে বসন্ত। প্রবীণ এই পৃথিবীটাই চিরনতুনের আবাহনে সরগরম হয়ে ওঠে। শুকনো পাতার বনে কচি পাতার কল্লোল জাগে। বাইরে যখন শীতের শীর্ণতা, চুলে যখন রাজার পাক ধরেছে, তখন তার অন্তরে জাগে বসন্তের বর্ণচ্ছটা। আসলে যার শেষ নেই, তার অবসান গীতি গাইবে কে? 'ফাল্গুনী'-কে ঘিরে পৌষ-ফাগুনের সেই সত্যকেই আরো একবার ফিরে দেখা হল এখানে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

9 789383 590717